তারিখ ... 09 SEP 1985(?) ... ৫ ৩
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
005

দৈনিক বাংলা

নিরক্ষরতার বেড়াল : ঘণ্টা বাঁধবে কে?

হোসনে আরা শাহেদ

গতকাল ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্ব নিরক্ষরতা সমস্যা দূর করার জন্য ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব এ দিনটির উৎস। এ প্রস্তাবে গুরুত্ব দেয়া হয় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের ওপর। পরের বছর অর্থাৎ বাষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসে রোমে এই নিরক্ষরতা দূর করার সমস্যা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। পঁয়ষট্টি সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানে বারোদিন ধরে চলে বিশ্বসাক্ষরতা সম্মেলন। এই সম্মেলনেই প্রতিবছর আটই সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিশ্ব জুড়ে প্রথম 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালিত হয় সাতষট্টি সালে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতোন এই দিন পালন করা হয় বাহাত্তর সালে। তিয়াত্তর সালে এই দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান ঠাকুরগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নিরক্ষরতামুক্ত গ্রাম কচুয়ার কৃষ্টপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে অধিবেশনটি ঠাকুরগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে সাক্ষরতা দিবসের ইতিহাস। বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে অনুন্নত ও অল্প-উন্নত দেশে, শিক্ষার প্রসারের এই যে উদ্যোগ, এক কথায় তা প্রশংসার। শিক্ষাকে যে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়, তার কারণে পুনরুচ্চারণ আজ বাহুল্য। জ্ঞান হচ্ছে শক্তি—এ শক্তি অর্জিত হতে পারে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা ছাড়া মানুষ অন্ধের মতোন। কুসংস্কার তাকে কূপমণ্ডুকে করে তোলে, জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ শিক্ষা বঞ্চিত। এক শিক্ষা সমস্যাই অন্যান্য সমস্যাগুলোকে জটিল করে তুলছে। জ্ঞান ও বিদ্যার অভাবে অন্যান্য সমস্যাগুলোর মূলে যেতে পারছে না, পরিচালিত হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতদের চতুর নীতিতে, পরিণত হচ্ছে দাবার ঘুঁটিতে।

চোখ খুলে তাকালেই দেখা যায়, যেসব দেশ জাতি আজ উন্নতি করেছে, তাদের মূলে শিক্ষাই কাজ করছে। ঘুরিয়ে বলা যায়, শিক্ষাই তাদের চক্ষুষ্মান করছে, করছে প্রদীপ্ত, করছে উদ্দীপ্ত।

আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে একদিকে, অন্যদিকে শিক্ষার হার কমছে। চুয়াত্তর সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে দশ বছর বয়সের বেশি নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল চার কোটি আশি লক্ষ। সর্বমোট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরের হার হচ্ছে ২২.২ শতাংশ। ১৯৬১ সালে এ হার ছিল ২১ দশমিক ৫ শতাংশ। একষট্টি থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত তের বছরে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ।

অবশ্য কেবল বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল দেশে আজ শিক্ষার করুণ দশা। জাতিসংঘের পরিসংখ্যানে যে তথ্য জানা যায়, তা মোটেও আশাপ্রদ নয়। বরং বলা যায়, অবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ মানে বোঝায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। এ সংগায় যারা নামটি সই করতে সক্ষম, তাঁরাই সাক্ষর। এই নিরিখেতেই বাংলাদেশে শতকরা বিশজন শিক্ষিত। অবশ্য সম্প্রতি সাক্ষরতার সূচীকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, না, শুধু নামসই-ই যথেষ্ট নয়, শিক্ষিত বলে পরিচিত হওয়ার জন্য নূন্যতম লেখা পড়া, হিসাব জ্ঞান থাকা চাই। এটা থ্রি-আর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রসারণ সংকোচনে সমাধান নেই। কেননা সমস্যা অন্যত্র। আমরা শিক্ষিত জনসম্পদ চাই, এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে কী করণীয়? অনেক কিছুই। এই অনেক কিছুও বলা হয়েছে অনেকবার। বয়স্ক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম। ক্র্যাশ-প্রোগ্রাম, সবই নিরক্ষরতা বিতাড়নের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই শুভ উদ্দেশ্য পূরণে শুভ উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে অনেক। বয়স্কদের জন্য বিপুল অংকে ছাপানো হলো বিস্তর বই, খোলা হলো সান্ধ্য-বিদ্যালয়। ছাত্রদের পাঠানোর ব্যবস্থা হলো ছুটিছাটায় গ্রামে, শিশুতোষ গ্রন্থ ছাপানো হলো রঙ-বেরঙের। পাঠ্যসূচীতে জোর দেয়া হলো শিক্ষার ওপর, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লেখানো হলো রচনা, চিঠি, ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ। বোর্ডের ফাইন্যাল পরীক্ষাগুলোতে নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞানের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষার মতোন নির্ধারিত করা হয়েছিল নম্বর। এই নম্বর ছিল আবশ্যিক, তবে চতুর্থ বিষয়ের নম্বরের মতোন অনেকটা, একটু বদলে। যেমন মোট যোগফলে যোগ হতো না, তবে ঘাটতি পূরণে ভর্তুকির কাজ করতো। ঘাটতি না থাকলে প্রাপ্ত নম্বর এমনিতেই মওজুদ থাকতো। এই প্রথা পরবর্তী পর্যায়ে তুলে দেয়া হয়েছে।

তবু শিক্ষা বিস্তারের সকল আয়োজন অর্থহীন হয়ে গেছে। কেন এমন হল? বৈরিতার জন্য। এ বৈরিতা কার। আমাদের সকলের। প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি ক্ষেত্রের। আমরা যে যেখানে আছি নিজস্ব ফায়দা লুটতে উদগ্রীব, সমষ্টি সেখানে মূল্যহীন। তাই কোনও কাজে হাত দিলে তা ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়, কালি-কাগজ কলম ঠিক থাকে তাই সবটাই কাজীর কেতাবী গরু হয়ে দাঁড়ায়।

এমন হতে থাকার কারণ দুটো : এক, পরিবেশ, দুই, চিন্তার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতাবোধ ও সমন্বয়ের অভাব। শিক্ষা জিনিসটি আজ এমনিতেই পণ্য বিশেষ। লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া সেই চড়ে। শিক্ষার এই রূপ দিনকে দিন ব্যবধান বাড়াচ্ছে। শিক্ষিত মানুষ জনসম্পদ বলে অশিক্ষিত যারা, তারা বোঝা বলে গণ্য হচ্ছেন। শিক্ষা বঞ্চিতদের শ্রমে শিক্ষিতদের পুষ্ট করছে বলে একই দেশের একই ভাষার একজন শিক্ষিত ও একজন শিক্ষাহীনের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। যেন দুস্তর পারাবার।

আমাদের ব্যাধিযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে আমরা শিক্ষার দ্বারা সিঁড়ি তৈরি করছি, সমতা নয়। এও অসহায় বাবা-মার আরেক ভয়। আতংকের বিষয় শিক্ষিত বেকারেরাও। সর্বস্ব বেচে মানুষ করা ছেলে প্রতিষ্ঠা পায় না, বিত্তহীন বাবা-মা এ বিলাসিতা মেনে নিতে পারেন না। শিক্ষা আজ সমস্যা সৃষ্টি করছে চক্রাকারে। এ বছরের পরীক্ষা হচ্ছে ও বছর ফল প্রকাশিত হয় আরও কবছর পর। চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধিই এ সংকট নিরসনের পথ নয়। চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের উপায় তৈরি করাই এ থেকে নিরসনের পথ।

এতো গেল পরিবেশগত দিক। দ্বিতীয় যেটা অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন চিন্তা, সেটা আরও মর্মান্তিক। মানুষের প্রধান চাহিদা অন্ন-বস্ত্র অর্থাৎ জীবন-ধারন। জীবনে বেঁচে থাকার জন্যই শিক্ষা, জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্যই শিক্ষা। কাজেই জীবন আসছে আগে, শিক্ষা পরে। শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয় শূন্য উদরে, উদাম দেহে। যে বিপুল জনশক্তিকে শিক্ষিত করে তোলার সূচী আমাদের, তার মধ্যে এই মৌল সমস্যার কথা নেই। নেই বলেই ধরে নেয়া যায়, শিক্ষাকে বিচার করা হচ্ছে ভিন্নভাবে। অথচ শিক্ষা জীবনের অংশ যেমন, তেমন অংশ সমগ্র সংকটেরও। বসন-পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা আকর্ষণের হতে পারে না। এ কারণেই সংকটের বাবা-মা সন্তানের দু হাতের শ্রমের ওপরই ভরসা করেন, মস্তিষ্কের পরিশীলনের ওপর নয়।

বাস্তব কঠিন। জীবন স্বপ্ন নয়। জীবনানুগ বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা আজও নেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে সকল শুভ-কামনা মার খাচ্ছে। হয় পরিণত হচ্ছে প্রহসনে, নয় হাস্যকর প্রকল্পে। ব্যর্থতা উভয় ক্ষেত্রেই।

উন্নত বিশ্বের মানুষেরা অনুন্নত বিশ্বের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছেন, এটা ভালো। আজ যারা আলোকিত, একদিন তারাও অন্ধকারে ছিলেন। এই শিক্ষার পথ বে তারা আজকের স্বর্গে পৌঁছেছেন। পৌঁছেছেন, কারণ তাদের পরিকল্পনায় যেমন সমগ্র চিন্তা ঠাঁই পেয়েছিল, তেমনি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় সমন্বয় ছিল। সবচে বড় কথা, তাদের চেতনা ও প্রেরণায় সততা ছিল, আন্তরিকতা ছিল।

আগেই বলেছি, আমাদের এখানে ফাঁক সর্বস্তরে, ফাঁকি সর্বত্র। তার ওপর ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। আমরা অংশ নিয়ে নৃত্য করি, ওপরটা দেখেই আত্মতৃপ্ত হই, মুষ্টিমেয়র স্বার্থেই কৌশল আরোপ করি, আমরা আজও অসফল মূলতঃ এ কারণেই।

এমন পরিস্থিতিতে ক্যালেন্ডারে আটই সেপ্টেম্বর ঘুরে ঘুরে আসে। মঞ্চ মাইকে উচ্চারিত হয় বহু তত্ত্ব আর তথ্য, ছাপা হয় সব কাগজে প্রচারিত হয় সযত্নে প্রচারযন্ত্রে, সকলেই শিক্ষার পক্ষে।

কিন্তু যে প্রশ্নটি আজও প্রকট, তা হচ্ছে, নিরক্ষরতা নামের এই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?